

# এক

আমার জীবনের শুরু লিবিয়ায়। আমার স্মৃতিতে লিবিয়া একটা সুখময় দেশ হিশাবেই রয়ে গেছে। আর সেই সুখের উপকরণগুলো ছিলো এইমাত্র ভেজে আনা ফ্রেঞ্চ পাউরুটি<sup>১</sup>, আটার রুটি আর বিশাল আকৃতির মিশরীয় চাপাতি। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন ক্যারিশম্যাটিক নেতা আর গভীর শ্রদ্ধার পাত্র মুয়াম্মার গাদ্দাফির স্বস্তি না গেয়ে কোনো উপায় ছিলো না। মেয়েদের কাছে তিনি তো একেবারে হার্টথ্রব ছিলেন (আমার মায়ের ডায়েরি খুললেই তার একটা ছবি দেখা যেতো)। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন পশ্চিমাদেরকে উচ্ছেদ করার বাতিকের কারণে। এর ফলে আমার মায়ের মতো শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি শিক্ষকের পদগুলো পেয়ে গেলেন। ইংলিশ রেডিও স্টেশনগুলোও তাদের দখলে চলে এলো। তার বেখেয়াল মেজাজের কথা বারবার উল্লেখিত হলেও তিনি যাদের শাসক ছিলেন তাদের চোখে তিনি ছিলেন এমন একজন শক্তিশালী নেতা, যাকে অন্যরা ভয় পায় এবং অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের পরও যিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন।

পরিবারের আরো অনেকের মতো আমার মা-ও ষাটের দশকের শেষ দিকে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যান। আমার বাবা ছিলেন একজন তরুণ ইএনটি সার্জন। তিনি লিবিয়া চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুদ্ধ জীবনাকাজক্ষী আমার মা তত দিনে পরিবার পূর্ণ করে ফেলেছেন : তিনি এক ছেলে এবং এক মেয়ের মা। তবু তারপর...আমি এলাম। বিশাল সাহায্য জন্ম নেয়ার কারণে হয়তো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাজ করে যাওয়া এবং বেঁচে থাকার ক্ষমতা আমি অর্জন করেছিলাম। আমার মায়ের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো আমি একজন সত্যিকার বেদুইন। আমার জন্ম আজদাবিয়ায়। এটি সুন্দর একটি ভূমধ্যসাগরীয় শহর, উত্তর-পশ্চিম লিবিয়ায় অবস্থিত। পরবর্তীতে আমরা বেনগাজীতে চলে যাই। যে সমাজে আমি বেড়ে উঠি, সেটা ছিলো উদারমনা। স্কাট পরা মহিলাদের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিতদেরকে চলতে দেখা যেতো। মূলত মহিলাদের মধ্যে প্যারিসীয় ফ্যাশন প্রীতি ছিলো। মুখজালি, চ্যাপ্টা টুপি এবং মৎস্যজালের লম্বা মোজার ব্যাপারে তাদের ছিলো ব্যাপক আগ্রহ।

সুখী শান্তিময় ছিলো আমাদের বাড়ির পরিবেশ। মা-বাবা সুখী ছিলেন। রান্নার সময় মা গান গাইতেন। আমি তাকে হাঁড়ি-পাতিল এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমার চার বছর বয়সের স্মৃতি স্পষ্ট মনে আছে। এর আগের কিছু দৃশ্যও স্মৃতিতে ঝলকানি দেয়। স্মৃতির এই অ্যালবাম আমাদের পরিবারের সে সময় সুখী-সমৃদ্ধ সময় পার করার কথাই তুলে ধরে। ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানীরা বড় বেতনের পদগুলোতে ছিলো। তাদের সামাজিক জীবন ছিলো রোমাঞ্চকর। আমার মনে আছে, আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ ফ্যাশনদুরন্ত মহিলা। পশ্চিমা স্যুট হোক আর ইন্ডিয়ান শাড়িই হোক, সব সময়ই তার পোশাকে সুন্দর রুচির প্রকাশ ঘটতো। ছবিতে তাকে মনোমুগ্ধকর দেখাতো। আমার বোন যদিও সে সময় একজন কিশোরী মাত্র, সেও বেশ ফ্যাশন সচেতন ছিলো। চোখে নকল পাপড়ি থেকে শুরু করে পিঠে বিশাল পাখনা লাগানো—কোনোটাই সে বাদ দিতো না। আমার আক্সা তার সুন্দরী স্ত্রী এবং মেয়েদের ছবি তুলতে খুব পছন্দ করতেন। আমি অবশ্য কখনো পোজ দিতাম না। পরিবারের প্রত্যেকটা ছবিতে আমার মাথা অন্য দিকে ঘুরানো থাকতো। আমার স্পর্ধিত এবং স্বাধীনচেতা প্রকৃতিই সেখানে সব সময় খাপ খেতো।

কখনো কখনো আমার স্বাধীন প্রকৃতি মা-বাবাকে ভাবাতো। আজদাবিয়ার ফ্লাটে আমরা যখন থাকি, তখন আমার বয়স দুই বছর। আমি এক দিন সিদ্ধান্ত নিলাম—নিজের গোপনীয়তা বজায় রাখার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। আমি বাথরুমে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম—যদিও এতে বারণ ছিলো। দুর্ভাগ্যবশত হাঁটি হাঁটি পা বয়সের একটা বাচ্চার জন্য দরজা খোলার চেয়ে আটকানো অনেক সহজ। আমি অবশ্যই সেখানে অনেকখানি সময় কাটিয়েছিলাম। একটা লম্বা কালো বাথটাবের কথা আমার মনে আছে। আমি শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম, একটু ফোঁপালামও না। অথচ বাইরে পরিবারের সবাই ভয়ে অস্থির।

---

<sup>১</sup> Baguette

আমি কখনো কাঁদিনি—এ দিক থেকে মনে হতে পারে আমি একটা অস্বাভাবিক শিশু ছিলাম। এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু প্রত্যেকেই আমার না কাঁদার কথা হলফ করে বলে। এমনকি এ কারণে আমাকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আমার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি না দেখার জন্য। হতে পারে আমি আমার বড় ভাইয়ের চেয়ে শান্ত ছিলাম। সে আবার কেঁদেকেটে প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতো। বাড়ির সবার সন্ধ্যাটা কাটতো তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য দোলানো আর গান গাওয়ায়। সবচেয়ে বেশি যে গানটা গাওয়া হতো, সেটা ছিলো : মুনির খান বনে গা সদরে পাকিস্তান (মুনির খান হবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট)।

সে দিনও আমি শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত পাশের ফ্ল্যাটের একটা ছোট মেয়েকে নিয়ে আসা হলো ছাদের জানালা বেয়ে নেমে এসে ভিতর থেকে দরজা খোলার জন্য। আমার মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমাকে কোনো রকম বকাঝকার মুখোমুখি হতে হলো না। আশোলে আমার মা সর্বোচ্চ দুটো ঘটনায় আমার উপরে রাগ করেছিলেন বলে মনে পড়ে। তার রাগ করার কোনো দরকার পড়তো না। তিনি আমার আর ভাইয়ের দিকে শুধু তাকালেই চলতো, আমরা নিষেধ অমান্য করতাম না। আমাদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে তার অস্ত্রটা ছিলো, ‘আমি তোমার সাথে কথা বলবো না।’ আমার আর ভাইয়ের জন্য এটা ছিলো মৃত্যুদণ্ডের মতো। এটা ছিলো কেয়ামত। আমাদেরকে গ্লাশের পর গ্লাশ দুধ খাওয়ানো অথবা স্কুলে ভালো করার উদ্দেশ্যে নির্যাতনের একটা কার্যকর যন্ত্র ছিলো এ কথাটা।

আমার নিজের বাচ্চাদের বেলায়ও অবিরাম খ্যাঁচখ্যাঁচানি অথবা কান ফাটানো চিৎকারের তুলনায় আমার আচমকা নীরব নৈরাশ্য অনেক বেশি কাজ করতো। একজন বাচাল মহিলার হঠাৎ নীরব হয়ে যাওয়া পরিষ্কার বিপদের একটা আলামত। মনে কষ্ট পাওয়ার মতো কোনো কিছু বলা এড়াতে আমি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য চুপ থেকে আমি আবার সচেতনভাবে যে কোনো বিষয়ে কথা বলা শুরু করতাম। তৎক্ষণাৎ বাচ্চারা বিষয়টা বুঝে ফেলতো। ওরা ওদের আচরণ ঠিক করে নিতো। নোংরা তর্কে আমি কখনোই যেতাম না। বিষয়টা কোনো কাজের হোক কিংবা সম্পর্কের ব্যাপারে হোক, আমার স্টাইল ছিলো গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাওয়া, কোনো রকম সাক্ষী না রেখে নিজস্ব পছন্দ রাগ ঝাড়া।

আমার বাবা ভদ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কখনো আমাদের দিকে অত কঠিন দৃষ্টিতেও তাকাননি। বাবার কাছে আমি খুব আদরের মেয়ে ছিলাম। বাইরে খাওয়ার জন্য বের হলে আজীবন আমি ছিলাম তার অপরাধের সঙ্গী। আমার মা সব সময় বাড়িতে বৈচিত্র্যহীন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার উপরে জোর দিতেন। সে কারণে বাবা আর আমি বাড়িতে আসার আগে বাইরে দুপুরের খাবারের সাথে আইসক্রিম খেয়ে নিতাম। কিন্তু সব সময়ই মায়ের কাছে ধরা খেয়ে যেতাম। কারণ স্কুল ড্রেসে লেগে থাকা আইসক্রিম আশোল কাহিনী ফাঁস করে দিতো। আমার বাবা লিবিয়াতেও জনপ্রিয় ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে সাধারণের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ডাক্তার হিশাবে সাধারণের কাছে একটা সম্মান তো তার পাওনা ছিলোই, গাড়ি মেরামতখানায় শুধু তার পেশার কথা বলামাত্রই কারিগররা মজুরি নিতে চাইতো না।

লিবিয়রা বেশ সহৃদয় ছিলো। তারা অন্যদেরকে প্রচুর উপহার দিতে পছন্দ করতো। কয়েকটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে : আমি উপহার নিতে না চাইলে তারা আঘাত পায়, সত্যি সত্যি তাদের অনুভূতিতে লাগে। মনে আছে : আমেরিকান বা ব্রিটিশ শিক্ষকদেরকে যখন বিদায় করা হলো, তাদের জায়গায় আমার মাকে বারংবার যোগ দিতে বলা হলো। মায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচুর উপহার আনতো। মা নিতে না চাইলে তাদের চোখ পানিতে ভরে যেতো। লিবিয়রা যে শুধু জিনিশপত্র দিয়ে তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো, তা নয়। আমাদের সাথে আরেকটা ইন্ডিয়ান পরিবার ছিলো। আমাদের বাড়িওয়ালা আমাদের সাথে একই বাড়ির মধ্যে থাকতেন। তারা যে বাড়িওয়ালা হিশাবে ভালো ছিলেন, শুধু তাই নয়; আমাদেরকে তারা নিজেদের পরিবারের লোকদের মতোই দেখতেন। একবার হলো কী, বাড়িতে ফিরে মা আমার বোনের সারা শরীরে দেখলেন মৌচাক আর ফুস্কুড়ি। বোঝা গেলো বাড়িওয়ালী তার নিজের মেয়েদেরকে ঐতিহ্যবাহী হালাওয়া মধু দিয়ে ওয়াস্কিং করাচ্ছিলেন। সুইটি তা দেখতে গেলে বাড়িওয়ালী তাকেও ওয়াস্কিং করিয়ে দেন।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ছিলো একটা হিন্দু পরিবার। মা-বাবা দুজনেই ডাক্তার। তাদের ছিলো দুটো ছেলে সন্তান। ছেলে দুটোকে দেখার জন্য ইন্ডিয়া থেকে একজন আয়া নিয়ে আসা হয়েছিলো। বাড়িতে বন্দী থাকতে অস্বীকার জানানোতে

আমার স্বাধীনতার লক্ষণ আরেকবার প্রকাশ পেলো। জরুরী কোনো কাজে এক সকালে আমার মা-বাবা আমাকে আধা ঘণ্টার জন্য বাড়িতে রেখে গেলেন। পাশের ফ্লাট থেকে টনি আর জনি যখন আমার সাথে খেলতে এলো, তারা দেখলো আমি ঘরের মধ্যে বন্দী। আমি তো দমার পাত্রী নই। ওদের ছোট ভাই জয়কে বললাম জানালায় লাগানো ভেনিসীয় স্টাইলের খড়খড়ির নিচ দিয়ে কয়েকবার হামাগুড়ি দিয়ে আসতে, যাতে এর নিচ দিয়ে আমার বের হওয়ার মতো একটা ফাঁকা তৈরি হয়। মিশন সফল হলো, আমরা ওদের ফ্লাটে খেলতে এলাম। প্রথমে খুব বেশি সময় থাকার চিন্তা ছিলো না। কিন্তু ট্রেন আর কিরি চিজে এত মগ্ন হয়ে গেলাম যে, আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। এর মধ্যে আমার মা-বাবা তাদের হারানো সন্তানের খোঁজে জীবনাশঙ্কায় পড়ে গেলেন। তারা সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেন, শুধু পাশের ফ্লাটে এলেন না।

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু পরিবারটা ছিলো সেকুলার। কিন্তু আমার মনে আছে : তাদের আয়া আমাদের আরতি নিতেন এবং প্রার্থনার পর তিলক পরতেন। আমার মা নিজে আমাদেরকে কুরআন পড়িয়েছেন। পাশাপাশি দুনিয়ার সব ধর্মের ব্যাপারেও জ্ঞান দিয়েছেন। আমাদের পরিবার ছিলো নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিম। আমার মা-বাবা দুজনই গুরুগুস্তানের উত্তরসূরী। গুরুগুস্তান হলেন কয়েস আবদুর রশিদের তৃতীয় ছেলে। তিনি পশতুনদের কল্পিত জনক, যিনি আমাদের অঞ্চলে ইসলামের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। কথিত আছে কয়েস মদিনা সফর করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকে রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাদের লোকদের বিশ্বাস হলো রাসূল স. কয়েসের নাম রাখেন আবদুর রশিদ, যার অর্থ ‘সুপথ প্রদর্শকের দাস।’ এ বিশ্বাস আরো ব্যাপক যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের মেয়ে সারাকে বিয়ে করে কয়েস তার জন্মভূমি ঝোব-এ নিয়ে আসেন। ঝোবের অবস্থান বেলুচিস্তান এবং খাইবার পাখতুনখোয়ার সীমান্তে। তার কবর সুলায়মান পর্বতে অবস্থিত। ‘কয়েস বাবার ঘর’ নামেও এটা পরিচিত।

আমার মায়ের পরিবার পন্নী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এটি আফগানিস্তানের একটি উপজাতি। ইন্ডিয়ার প্রথম পশতুন শাসক বাহলুল লোদীরও আগে তারা এ অঞ্চলে আসে। লোদী এসে তাদের সহযোগিতা চাইলেন। তখন তারা উট-ঘোড়া পালতো। আমার বাবা এসেছেন সোয়াতী উপজাতি থেকে (আফগানিস্তানের শালমান থেকে তারা এসেছে)। তারা মাহমুদ ঘোরীর সময় সোয়াতে আসে। পরবর্তীতে সপ্তদশ শতকের শুরুতে জালাল বাবার সাথে মিলে তারা হাজারা থেকে তুর্কীদেরকে উচ্ছেদ করে। তখন থেকে সোয়াতীরা পর্বত এবং সমতল ভূমি দখল করে। মানশেরা এবং বাস্তাগ্রাম জেলায় তারাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জমির মালিক। আমার বাবা সোয়াতীদের লুঘমানীয় অংশের। এরা বাফফা, বালাকোট এবং বাস্তাগ্রামে স্থায়ী হয়। পশতুভাষী এই অঞ্চলের লোকেরা খুবই ধার্মিক।

আমার বাবার পরিবারে কুরআন এবং তাফসির শিক্ষার একটা রেওয়াজ ছিলো। তবে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা পাওয়াতে তাদের মধ্যে কখনো গোঁড়ামি অথবা অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখা যায় না। পরিবারের প্রত্যেকটা মেয়ে উচ্চ শিক্ষিত। ইন্ডিয়া ভেঙে দুটো রাষ্ট্র হওয়ার আগে আমার বাবার বোনেরা দিল্লির আলীগড় কলেজে পড়াশোনা করেন। খাইবার পাখতুনখাওয়ায় অবস্থিত আমাদের বাফফা গ্রাম থেকে ট্রেনে সেখানে যেতে দু দিন লাগতো। বিয়ের আগ পর্যন্ত তারা দুজনেই শিক্ষাবিদ হিসাবে কাজ করেন। এ রকম প্রগতিশীল মনোভাবের মানে হলো আমাদের পরিবারের সন্তানেরা এমন একটা পরিবেশে বেড়ে উঠেছে যেখানে গোঁড়ামি কিংবা অসহিষ্ণুতা কোনোটাই ছিলো না।

আমার মতে অন্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ পায়। কয়েক বছর পর একজন পাকিস্তানী বৃদ্ধা আমাকে বলেছিলেন, ‘সাদা চামড়ার ছেলেদের সাথে যখন ওরা ঘুরতে যায়, সেটা তো খারাপই; কিন্তু কালোদের সাথে কীভাবে ওরা মেশে?’ এ কথা শুনে আমি আহত হয়েছিলাম। এ ধরনের মানসিকতা একেবারে অস্বাভাবিক ছিলো না। নিজেরা কালো হয়েও আমাদের সমাজগুলো ছিলো কালোদের প্রতি এবং আমাদের সম্প্রদায়ের কালো চামড়ার লোকদের প্রতি ভয়ঙ্করভাবে সাম্প্রদায়িক। হয়তো এখনো আছে। এমনকি আমার নানী নিজে ফ্যাকাশে লাল চামড়ার মহিলা হয়েও কেউ কোনো তামাটে রং পেলে অথবা আল্লাহ না করুন কালো হয়ে জন্ম নিলে অভিযোগ করতেন।

ছোট বেলা থেকে নানান সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায়ের সাথে মেশার কারণে আমি বহু ভাষায় কথা বলতে পারি। উজ্জ্বল বর্ণের হওয়াতে জনপ্রিয় দম্পতির বাচ্চাল ছোট বাচ্চাটি না হয়ে আমি বেনগাজীর পাকিস্তানী সম্প্রদায়ের সামাজিক বৃত্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলাম। বড়রা আমাকে স্নেহ করে গান-কৌতুক শেখাতেন, আমিও সে সবে মজে যেতাম। আমার তিন বছর বয়সের টেপ রেকর্ডিং আছে। তাতে আমি পাঞ্জাবি ভাষায় সর্দারদের (শিখ) কৌতুক বলছি। এগুলো শিখেছিলাম ইন্ডিয়ান খালাদের কাছ থেকে। পাঞ্জাবি আমার মাতৃভাষা নয়। কিন্তু তাতে আমার কেমন আকর্ষণ ছিলো সেটা বোঝা যায়। আমার মায়ের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ছিলো ব্যাপক। তিনি কবিতার বড় ভক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকে আমি সংখ্যা এবং কবিতা মুখস্থ রাখা শিখেছি। আট বছর বয়সেই উর্দু কবিতার ইউলিসিস ড. ইকবালের শিকওয়া এবং জওয়াবে শিকওয়া আমি আবৃত্তি করতে পারতাম।

কেউ হয়তো কোনো এক সময় আমার মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় উত্ত্রা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে, পাশের ফ্লাটের বাচ্চাদের সাথে খেলতে গিয়ে আমি একবার হিন্দু দেবতাদেরকে নিয়ে কটু মন্তব্য করেছিলাম। কী বলেছিলাম তা মনে নেই। আমার মা ভদ্রতার সাথে আমাকে সংশোধন করে দিলেন। ঘুমানোর সময় রসূল মুহাম্মাদ স. এবং তাঁর সাহাবীদের গল্প শোনালেন—তাদের নিজেদের লোকেরা তাদেরকে পাথর মারার সময়ও তারা কী আচরণ করেছেন।

বাচ্চা হিসাবে আমার কিছুটা নজরদারি অথবা বিশ্রামের দরকার ছিলো। আমি মনের আনন্দে একা একা প্লাস্টিসিন নিয়ে খেলতাম অথবা পাশের ফ্লাটের ছেলেদের সাথে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। জীবনে আমি খুব বেশি টিভি দেখিনি। তবে শেষ নবী মুহাম্মাদ স.-এর জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত দি মেসেজ ছায়াছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এটা মনে আছে। আমাদের টিভিটা ছিলো ডাইনিং রুমে। সেখানে বসে আমি রাতের পর রাত একা একা ছবিটা দেখেছি। তখন আমার বয়স চার-পাঁচের বেশি হবে না। কিশোর বয়সের আগে কোনো মানসম্পন্ন টিভি প্রোগ্রাম অথবা কার্টুন দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার সৌভাগ্য যে, আমি একটা কল্পনা শক্তি পেয়েছিলাম। সেই সাথে আমার মা-বাবা আমাকে শান্ত রাখার জন্য কখনো টিভি ব্যবহার করেননি। সত্যি কথা বলতে কী, খুব কম লোকই আমার মতো মনোযোগী মা-বাবা পাওয়ার কথা দাবি করতে পারবে। আমার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী মা নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনুপ্রেরণা ছিলেন। তিনি আমাদের সুন্দর জীবন শুরু করিয়েছেন, যেটা অসংখ্য শিশু পায় না। জন্ম দিনের অনুষ্ঠানগুলো অনেক বড় হতো। অনেক লোক আসতো। আমার মা কল্পনার সব দারুণ কেক বানাতেন। তিনি যা-ই করতেন, নিখুঁতভাবে করতেন। তার এই বড় গুণ আমাদের কাছ থেকেও প্রত্যাশা করা হতো। আমরা সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতাম তিনি যাতে হতাশ না হন। শেষ পর্যন্ত আমরা তার গুণ ছাড়াই বেড়ে উঠলাম। তিনিও অবশেষে এটা মেনে নিলেন : শুধু নিখুঁত হওয়ার মানেই জীবন নয়। নিখুঁত না হওয়ার মানে অনন্য হওয়া।

টাকা-পয়সা থাকা ভালো, তবে জীবনের বিশিষ্টতা আরো ভালো। আমার বড় বোন খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিলো। এ সমস্যাটা না থাকলে আমার মা-বাবা ফিরে আসার কোনো চিন্তা করতেন না। কিন্তু বেশির ভাগ অভিবাসীর মতোই মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা তাদের কাছে ছিলো অনেক বড় একটা উদ্দীপনার ব্যাপার। আমার বাবা ইংল্যান্ডে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমার মা সে দেশে কেনাকাটা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য যেতে নারাজ। তিনি বাবাকে বরং পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

লিবিয়ায় আমার পাওয়া যে সব পুরস্কার টিকে ছিলো সেগুলোর মধ্যে একটা হলো চিত্র এবং হাতের কাজের একটা জুতার বাকশো। এতে অন্য সব জিনিশের সাথে ছোট ছোট অনেক কিছু ছিলো। ছিলো ধাতুপাতের বাঁকা চাঁদ, তাতে সবুজ রঙের ঝলকানি। আমিই তা কেটেছিলাম। ফিরে আসার আনন্দে আমি পাকিস্তানী পতাকা বানানোর জন্য টুকরাগুলোকে সাদা-সবুজ বানালাম। কিন্তু এটাকে ব্যাগে ঢোকানো হবে—এই ওয়াদা পাওয়ার পরও সেটা রয়ে গেলো। আমার সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে—এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার মনে আছে আমি নাছোড়বান্দার মতো মায়ের কাছে ঘ্যানঘ্যান করছিলাম আমার সেই জিনিশগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। পশতুনদের (পাখতুনওয়ালী নামে পরিচিত) মধ্যে কঠোর আচরণবিধি রয়েছে, যেটা আমাদেরকে উচ্চ মানের আতিথেয়তা এবং বন্ধুত্বের বন্ধনে আটকে রাখে। প্রতারণার শিকার হলে এটা আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা ছোট একটা ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু শিকড়ের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল থাকার কারণে আমি অনেক বছর আমার মা-বাবাকে ক্ষমা করতে পারিনি—তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছেন বলে।

পাকিস্তানের জীবন সুন্দর হওয়ার কথা ছিলো। আমার মা পেশোয়ার শহরে তার যে বোনকে এত দিন খুব মিস করেছেন, তার পাশেই নিজের স্বপ্নের বাড়ি বানালেন। এই শহর থেকেই তিনি কলেজে যেতেন। তবে জিয়া উল হকের সামরিক শাসনের মধ্যে পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তিনি আমেরিকার পক্ষ নেয়ায় সত্যিকার অর্থেই দৃশ্য বদলে যায়। সব জায়গায় আফগান শরণার্থী। অভিজাতদের মতে এ সব গরিব লোক এসে তাদের পল্লবিত শহরতলীর শান্তি নষ্ট করছে। আরামে থেকে আমরা ভুলেই গেলাম যে, আফগানিস্তানে আমাদের পাকিস্তানীরা যুদ্ধ করছে বলেই তারা বাড়িছাড়া। আমার মনে আছে, সিএসডি (সামরিক দোকান) থেকে যে পনির এবং তেল কিনতাম তার উপরে স্পষ্ট সিল লাগানো থাকতো, ‘আফগান শরণার্থীদের জন্য—পুনঃবিক্রির জন্য নয়।’ রুহিয়া নামে এক শরণার্থী বান্ধবীও জুটে গেলো আমার। মধ্য রাতের বোমা বর্ষণ থেকে তাদের বেঁচে আসার ভয়ঙ্কর কাহিনী সে আমাদেরকে শুনালো। আসার সময় নগদ টাকাগুলো তার মোজার মধ্যে ভরে নিয়েছিলো। কিন্তু নিরাপদে আসার জন্য পানি-কাদা পার হতে গিয়ে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

এর মধ্যে আমাদের বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল নিয়ে আমার সামনেই মা-বাবা তর্কে জড়ালেন। আমার মা তুললেন পাঁচ ফুট ওয়াল। সাজসজ্জার জন্য মাঝে মাঝে ফাঁকা রাখা হলো। কিন্তু ৮০’র দশকের সংস্কৃতির ঝাঁক ছিলো পর্দার দিকে। শেষ পর্যন্ত মা হার মানলেন। পুরো বাড়ি ঘিরে নয় ফুটের উঁচু দেয়াল তোলা হলো। তখনকার দিনে এরই চল ছিলো। তিনি এ বিষয়টা পরবর্তী অনেক বছর অসন্তোষের সাথে তুলতেন। তার কাছে মনে হলো তার বাড়িটাকে একটা জবরদস্ত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে।

আমাকে ছোট ছোট কিছু কালচার নিয়ে বিপদে পড়তে হলো। অপরিচিত ঘ্রাণ আর পরিবেশনের কারণে অসংখ্য অভিবাসী শিশুর মতো আমিও স্থানীয় এবং দুগ্ধজাত পণ্য খেতে চাইলাম না। আমার ওজন কমা নিয়ে আমার পরিবার ব্যাপক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। কিন্তু একটা বাচ্চার কাছেও সমৃদ্ধিশালী লিবিয়া আর পশ্চাদগামী পাকিস্তানের মধ্যে তফাতটা একেবারে চাক্ষুষ ধরা পড়লো। মূলত যে দেশটাকে আমার মা-বাবা এত দিন মিস করেছেন সে দেশটার ব্যাপারে আমার প্রথম পর্যবেক্ষণ ছিলো, ‘তোমাদের দেশ খুবই টুটা ফুটা (ভাঙাচোরা)।’

তারা যে পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন সেটা ছিলো পতনোন্মুখ। কিন্তু ফাটলগুলো তখন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।